ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607003

রবীন্দ্রসংগীতে বাণী ও সুরের ছন্দসংশ্লেষ: তুলনামূলক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ

ফজলে এলাহি চৌধুরী*

Abstract: In the history of Bangla music, Rabindra Sangeet stands out as a unique artistic treasure for its rhythmic diversity. To identify the reflections of Rabindranath's rhythmic thought in his music, it is crucial to compare the rhythm of his song lyrics with the rhythm of the compositions themselves. This study examines selected songs—considering the evolution and culmination of Rabindranath's musical creation—through textual, comparative, and descriptive methods to analyse the rhythmic characteristics of both the lyrics and the melodies. We observe that his thoughtful approach to rhythm endowed his songs with remarkable variety. The aesthetic rhythm that pervades Rabindra Sangeet often aligns with the rhythmic structure of the lyrics—the arrangement of syllabic stress and metrical patterns in the words sometimes influences the musical rhythm. At other times, the song's rhythm disregards or overrides the inherent rhythm and stress of the lyrics. Even songs set to the same tāl (metrical cycle) often display diversity through variations in laya (tempo). Thus, through rhythmic innovativeness, Rabindra Sangeet attained its artistic distinction and grandeur.

মুখ্যশব্দ: রবীন্দ্রসংগীত, বাণীর ছন্দ, সুরের ছন্দ, পর্ব, তাল, লয়

ভূমিকা

গান সৃজনে চেতনাস্পর্শী সুরব্যঞ্জনা ও বোধসঞ্জাত বাণীময়তার সম্পর্ক একইসঙ্গে অনিবার্য এবং অস্থির। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা চলে, এই অমোঘ অস্থির সম্পর্কই সংগীতকে একদেশদর্শী শিল্প সীমাবদ্ধতা থেকেও রক্ষা করে। গানে সুর এবং বাণীকে বেঁধে রাখে অলোকসামান্য ছন্দের সুষমা, যা গীতিকবিতার রসাবেদন থেকে নির্বিকল্পভাবে সরে এসে গানের নিজস্ব ছন্দ-কাঠামো অনুসরণ করে স্বতন্ত্র শিল্পকলার সৌধ নির্মাণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে নির্বাচিত রবীন্দ্র-সংগীতের

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আলোকে রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ এবং গীতিকবিতার ছন্দের দূরত্ব ও নৈকট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সূত্রে শিল্পসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস গৃহীত হবে।

বিষয়ের বিবরণ ও গবেষণা-প্রশ্ন

কবিতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা সুচিহ্নিত নয়। কবিতার 'ছন্দ' কবিতার কোনো অনিবার্য উপকরণ নয়– অর্থাৎ, কবিতাকে 'কবিতা' হয়ে ওঠার জন্যে ছন্দের শাসন না মানলেও চলে। গানের বাণীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকা*কে যদি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখব নিছক গদ্যও গানের কবিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কাছে মর্যাদা পেয়েছে। কবিমনের আবেগের ওপর নান্দনিক শাসনকে আমরা কবিতার ছন্দ বলতে পারি– যেখানে থাকবে সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিমিত বাক-বিন্যাস, অর্থাৎ ধ্বনিগত গতিসৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দসমূহ মান্য করে নির্মিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। গানের কবিতার ছন্দের নির্ণায়ক মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর। গানের কবিতার ছন্দ নির্ণয় করতে পর্ববিন্যাস, মাত্রাগণনার হিসাব প্রয়োজন। কবিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ছন্দে মাত্রা হিসেবে বদ্ধাক্ষর গণনার রীতি আলাদা– এমনকি সেখানে অতিপর্ব ও অসম্পূর্ণ পর্ব থাকতে পারে। অন্যদিকে, গানের ছন্দ মোটেই গানের বাণীর ছন্দ নয়। গানের ছন্দ হচ্ছে বাণীর সুরসমেত বিন্যাস, যা একজন রচয়িতা স্বরলিপিতে চিহ্নিত করে দেবেন– এটাই প্রত্যাশিত। বাংলা গানের জগতে, এই প্রত্যাশা অফুরান ঐশ্বর্যে পূরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানের ক্ষেত্রে 'ছন্দ' অনিবার্য উপকরণ। সেখানেও পর্ব থাকে কবিতার ছন্দের মতন, তবে মাত্রা গণনার অনুশাসন স্বতন্ত্র। অসম্পূর্ণ পর্ব থাকবার কোনো সুযোগ গানের ছন্দে নেই। গান নিছক 'কবিতা' নয়। গানে কাব্যপ্রতিম বাণী থাকলেও এতে সুরের সুষমা রয়েছে যা নির্দিষ্টমাত্রিক পর্ব দিয়ে গড়া তালে বা ছন্দে নিবদ্ধ থাকে।

শিল্প হিসেবে রবীন্দ্রকবিতা ও গানের বাণীর নিকটবর্তিতা মেনে নিই আমরা। প্রথম প্রকাশিত 'গীতবিতানে'র কালানুক্রমিক বিন্যাস বদলে দিয়ে ভাবের অনুষঙ্গ বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে *গীতবিতান* প্রকাশ করেছিলেন যেন কবিতা হিসেবে তার গানসমূহ আস্বাদনযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সেই অর্থে, রবীন্দ্রনাথের গানের সকল বাণীই কবিতা, যদিও সকল কবিতা গান হবার উপযুক্ত নয়। কারণ, কবিতা থেকে তিনি যখন গানের বাণী নিয়েছেন, তার আকৃতিকে সংহত করেছেন– *বলাকা* কাব্যের ৬ সংখ্যক কবিতা 'ছবি' থেকে নেয়া 'তুমি কি কেবলই ছবি' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, কবিতার মতো সংগীতও ভাবের ভাষা (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ১৫)। যেকোনো সুর যখন বাণীকে বহন করে আনে তখন তা আঞ্চলিক হয়ে ওঠে, ভাষার কারণে সুরের বিমূর্ততা আরও মূর্ত হয়ে ওঠে গানে। ভাঙা গানগুলোর কথা বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি, গানসৃষ্টির প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ প্রভাবিত, কখনো-বা প্রথাগত। কবিতা ও গানের ছন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তার

মধ্যে একটি বিশেষ ভাবনা তাঁর গানের ছন্দকে মৌলিক করে তোলে– "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ৬০)। প্রথাগত ছন্দের বন্ধনকে তিনি ক্রমে মুক্তি দিলেন এই ভাবনা থেকেই, বাণীর ছন্দের সঙ্গে গানের ছন্দের সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রচলিত একই তালে নিবদ্ধ গানের লয়ভেদ করে, একই গানে একাধিক ছন্দের ব্যবহার করে, কখনো-বা সুরকে গুরুত্ব দিয়ে গানের বাণীর ঝোঁককে এড়িয়ে নতুন এক ছন্দের জগৎ নির্মাণ করলেন রবীন্দ্রসংগীতে। তাঁর গানের বাণী নির্যাসের মতো সূক্ষ্মাকৃতির– সাধারণত চার-তুকে বিন্যস্ত। রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর ছন্দ এবং সেই বাণীতে সুর বসিয়ে নির্মিত গানের ছন্দের সম্পর্ক, সামঞ্জস্য ও প্রভেদ খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। তাঁর গানের বাণী ও সুরের ছন্দসংশ্লেষ ও তুলনামূলক ছন্দবৈভব চিহ্নিত করতে একটি প্রশ্ন এই গবেষণায় সহায়ক হয়েছে–

রবীন্দ্রগানের বাণীর ছন্দ ও সুরের ছন্দের সম্পর্কের স্বরূপ কীরূপ?

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এ গানের বাণীর ছন্দ এবং 'স্বরবিতান'-এ চিহ্নিত রবীন্দ্রনাথের বাণীবাহী সুরের ছন্দ [তাল] বিশ্লেষণ-পূর্বক তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রসংগীত-পদ্ধতির বিশেষ দিক উন্মোচন করা এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমরা জানি, গানের কবিতার ছন্দ ও সুরের ছন্দের নির্মাণে সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা দীর্ঘকালের। জীবনের প্রারম্ভ থেকে পরিণত বয়স অবধি রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও ছন্দনির্মাণ একরৈখিক নয়। যেন রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং পরিণতিকে চিহ্নিত করতে পারে এই ভাবনাকে মাথায় রেখে নির্বাচিত গানের বাণীর ছন্দের সঙ্গে ওই গানের ছন্দের ধরন তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণায়। বাণী ও সুরগত ছন্দের পাঠ-বিশ্লেষণপূর্বক তুলনার মধ্য দিয়ে ফলাফল বেরিয়ে এসেছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

গুণগত গবেষণা-কাঠামো ব্যবহার করে বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুরের ছন্দগত বিবেচনা করতে গিয়ে সুরস্রষ্টা হিসেবে তাঁর ক্রমযাত্রা ও পরিণতিকে চিহ্নিত করতে পারে এমন গান নির্বাচন করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় ভাঙা গানের বাণী, বিলেতি ভাঙা গানের বাণী, রবীন্দ্রপ্রবর্তিত তালের নেপথ্যে থাকা গানের বাণী, প্রথাগত কবিতার ছন্দে লিখিত গানের বাণী, কবিতা থেকে নির্মিত গানের বাণী, তালছাড়া গান বা ঢালা গানের বাণী, সুরান্তর রয়েছে এমন গানের বাণী, ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ পাওয়া যায় এমন গানের বাণী এবং সুর শাসন করে এমন গানের বাণী বেছে নেয়া হয়েছে। গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষকের জানা রয়েছে এমন গানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গানের কবিতা সুরে বিন্যস্ত হলে গান হিসেবে আশ্চর্য এক পরিণতি

লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী গান হিসেবে বিকাশকালে পূর্বতন ছন্দ থেকে কতটুকু কীভাবে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে বা বাণীর ছন্দের সঙ্গে কতটুকু কীভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে তার বিবেচনায় কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ করে গানে তার রূপান্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। বাণীগত ধ্বনিবিন্যাস সুরের বিন্যাসে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, সুর বাণীকে কতটুকু কীভাবে মান্য করেছে, বাণীর ঝোঁককে সুর কখনো-বা অগ্রাহ্য করেছে কি-না এইসকল বিবেচনায় 'আকর' হিসেবে *গীতবিতান* ও রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাঙা গানের ছন্দ আলোচনায় মূল গানের সুরের সন্ধান করা হয়েছে। গবেষণাটিতে পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা

গানের বাণী এবং গানের ছন্দ– দুইটি ভিন্ন ব্যাপার। গানের ছন্দ আলোচনার পরিভাষা শিল্পরসবোদ্ধাদের কাছে জলচল না হওয়ায় বুদ্ধদেব বসু গানের ছন্দকে গানের বাণীর ছন্দে নির্দেশ করেছিলেন। শরৎ প্রকৃতির বর্ণনাঢ্য একটি গান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর না হোক, গানে মিলবর্জন ও ছন্দোমুক্তির প্রথম উল্লেখ্য উদাহরণ 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে" (বুদ্ধদেব, ১৯৯৩, পৃ. ২৮)। শঙ্খ ঘোষও গানের ছন্দকে গানের বাণীর ছন্দে নির্দেশ করেছেন (শঙ্খ, ১৯৮২, পৃ. ১১৭)। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, "তাঁর প্রথম যুগের কিছু গানে আছে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্তের ব্যবহার, তার পরে প্রায় অব্যাহতভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্রাবৃত্ত (সরল কলাবৃত্ত) এবং ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ, আবার ঐ 'গদ্য'-গানগুলিকে ব্যতিক্রম ধরে এ-কথা বলছি" (পবিত্র, ১৯৮২, পৃ.৬)। অর্থাৎ, তিনি গানের ছন্দ হিসেবে গদ্য ছন্দকেও নির্দেশ করেছেন। গানের বাণী অমিত্রাক্ষর হতে পারে, স্বরবৃত্তে হতে পরে, অক্ষরবৃত্তে হতে পারে, গদ্যেও হতে পারে– অথচ গানের ছন্দ তা নয় মোটেই। গানের ছন্দ হচ্ছে গানের সুর যেই তালে নিবদ্ধ থাকে, সেইটে। গানের ছন্দের ব্যাপারটি গান শুনবার মুহূর্তে পাওয়া যায় এবং স্বরলিপিতে পুরো ব্যাপারটি চিহ্নিত থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেহেতু তাঁর গানের সুরের অবিকল্প রূপ দেবার জন্যে স্বরলিপি করে গেছেন, তাই আমরা খুব সহজেই সেই গানের সুর ও তালের সন্ধান লিখিত আকারে রবীন্দ্রসংগীতের *স্বরবিতান*সমূহে পেয়ে থাকি। সেখানে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনথের গানের ছন্দকে দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, চৌতাল, ধামার, নবতাল, ষষ্ঠীতাল, একতাল, নবপঞ্চতাল, ঝাঁপতাল– এমন নানান নামে উল্লেখ করেছেন। কখনো-বা সেই উল্লেখ নেই, কিন্তু স্বরলিপিতে ছন্দের নির্দেশনা রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দের মাত্রা খুবই সূক্ষ্মভাবে মান্য করা হয় এবং সিকিমাত্রারও নিখুঁত হিসেব থাকে সেখানে। অর্থাৎ, গানের লয় থেকে সরে এলে গানের তাল বা ছন্দ কেটে যায় সেই গানে।

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী যেহেতু বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দসমূহকে মান্য করেছে, তাই সে প্রসঙ্গে আলাপ জরুরি। তিনটি প্রধান ছন্দ পাঠ করতে গেলে আমরা অনিবার্যভাবে ভিন্ন ভিন্ন লয় পাই। যেমন– স্বরবৃত্ত ছন্দ [লয়: দ্রুত]:

মৃত্যু স্বয়ং | বিস্মরিল | আজকে মোরে | ৪+৪+৪
অস্তমিত | বিধির আমি | ভুল ৪+৪+২ ('অর্কেস্ট্রা', সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৭৬, পৃ. ৮৯)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ [লয়: মধ্য] :
একটি কথার | দ্বিধাথরথর | চূড়ে ৬+৬+২
ভর করেছিল | সাতটি অমরা | বতী ৬+৬+২ ('শশ্বতী', সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৭৬, পৃ. ৭৫)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ [লয়: ধীর] :
আমার বিদেশী নাম | বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায় ৮+১০
বৃথা ও-স্বারক চিহ্ন, | চিরতরে নিতেছি বিদায় ৮+১০ ('পণ্ডশ্রম', সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৭৬, পৃ. ৮৯)

উপরিউক্ত কোনো-একটি ছন্দের যেকোনো কবিতায় একই লয়ে চলবে। কবিতার একই ছন্দে লয়ের কোনো ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে, গানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন লয়ের গান একই ছন্দে থাকতে পারে। যেমন, দাদরা তালে দ্রুত লয়ের গান: 'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার'; মধ্য লয়ের গান: 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।

আমরা সাধারণত কবিতায় কোনো শব্দকে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রার সমষ্টি হিসেবে গণনা করি, তা কেবল শব্দের ধ্বনিবিন্যাসের রীতি অর্থাৎ মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের মাত্রা গণনার রীতির ওপর নির্ভর করছে। যেমন– 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা' বাক্যটির মুক্তাক্ষর সকল ক্ষেত্রে এক মাত্রা, এবং বদ্ধাক্ষর ক্ষেত্রবিশেষে এক মাত্রা বা দুই মাত্রা। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে গানের ছন্দ বিবেচনায় গানের বাণীর মুক্তাক্ষর বদ্ধাক্ষর কোনো মুখ্য বিষয় নয়। শব্দগুলো যে সুরে বাঁধা, সেই বিন্যস্ত সুরের পর্ব এবং আবর্তন বিবেচনা করা হয়। কবিতায় যেটি এক বা দুই মাত্রা ছিল গানের ক্ষেত্রে তা এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় ইত্যাদি মাত্রিক হতে পারে। "তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা"– এখানে কবিতার ক্ষেত্রে 'ছবি'র 'বি' একমাত্রা ছিল, গানে হয়ে গেল ছয় মাত্রা। শেষের অক্ষরটিকে টেনে প্রলম্বিত করা হলো গানে। গানের ক্ষেত্রে একই ছন্দোবদ্ধ গান ভিন্ন ভিন্ন লয়ে গাওয়া গেলেও গানটি যে লয়ে শুরু করা হয় গানটি শেষাবধি একই লয়ে গাইতে হয়। গায়ক যদি সিকি মাত্রাও লয়চ্যুত হন, তবে তিনি ছন্দোচ্যুত হন। অর্থাৎ, গানের তাল কেটে যায়। ফলে, একটি গানের তাল যা-ই হোক তার একটি মাত্রার সঙ্গে অপর মাত্রার দূরত্ব সবসময়ই সমান হতে হয়।

কবিতার ক্ষেত্রে স্বরবৃত্তে একটি মুক্তাক্ষর ও একটি বদ্ধাক্ষর সমমাত্রার ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনায় সমমাত্রার হতে পারে না। মাত্রাবৃত্তে মুক্তাক্ষর এক মাত্রা, বদ্ধাক্ষর দুইমাত্রা। এমনকি অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে বদ্ধাক্ষর হলে দুইমাত্রা, আর শব্দের শুরুতে এবং মাঝে বদ্ধাক্ষর হলে এক মাত্রা হয়। আবার একটিমাত্র বদ্ধাক্ষর যদি পদের মর্যাদা পায় তবে তা হবে দুই মাত্রা। মুক্তাক্ষর এক মাত্রাই থাকছে। কবিতার মাত্রা বিভাজনের রীতি প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম নিক্তিতে মাপা সম্ভব নয়। কবিতা কণ্ঠে পাঠ করবার ও কানে শুনবার বিষয়, এমনকি মনে মনে পাঠ করেও তা আস্বাদন-সম্ভব।

একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে কেউ যদি ছন্দে পাঠ করতে না পারেন, তা হলে কবিতার কোনো ক্ষতি হয় না; কবিতা ছন্দোবদ্ধই থাকে। কেননা কবিতার পাঠক কবিতা-শিল্পকে সাধারণ আস্বাদনকারীর কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেন না। তা জরুরিও নয়।

গান গায়ক-নির্ভর শিল্প। গায়ক কেবল এই শিল্পকে পৌঁছে দেবার বাহন। তিনি সংগীতস্রষ্টা এবং সাধারণ শ্রোতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে অনন্য ভূমিকা রাখেন। গায়কের সক্ষমতার অভাব থাকলে শিল্প হিসেবে এটি খর্ব হতে পারে। গায়কের ছন্দোজ্ঞান আর সুরজ্ঞানই রবীন্দ্রসংগীতকে সফল করার জন্যে যথেষ্ট, যদি শিল্পীর সাংগীতিক বোধ থাকে তবেই গান নান্দনিক হয়ে ওঠে।

গানের ক্ষেত্রে গানের ছন্দ, লয় একেবারেই সূক্ষ্ম; যার প্রতিটি মাত্রা নির্দিষ্ট মাপে চলে। বাণীর কোনো মাত্রা এখানে মুখ্য নয়। গানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পর্বে সুরের নির্দিষ্ট মাত্রায় বিন্যস্ত থাকে এবং তা বিভিন্ন লয়ে পরিবেশন করা সম্ভব। বাণীর ভাব এবং সুরের ধরনই গায়ককে লয় নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে থাকে। শিল্পী বা সংগীতপরিবেশনকারী এক্ষেত্রে কখনো-বা সামান্য স্বাধীন, লয় নির্ধারণে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ছন্দকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বাঁধাধরা তালের নিয়ম থেকে। তিনি তালকে ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ২৭০)। একই স্থানে সম-এ ফিরতে হবে এই নিয়মের বিপক্ষে কথা বলেছেন তিনি– "...আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ২৭০)। একই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "...আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান, তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে

হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ২৭১)। তিনি যেমন ভেবেছিলেন কবিতায় ছন্দ যে নিয়মে চলবে, গানে তাল সেই নিয়মে চলবে, তেমনই তিনি ভেবেছিলেন "কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯, পৃ. ৬১)। অর্থাৎ, তিনি লয়কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন গানের ছন্দ নির্মাণে ও ছন্দ নির্ধারণে। তাঁর এই সকল চিন্তা তাঁর গানের বাণীকে গানে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

এই অংশের শুরুতে জেনেছি, গানের ছন্দ প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে শিল্পতাত্ত্বিকগণ প্রকারান্তরে বাণীর ছন্দ নিয়ে কথা বলেছেন। গানের ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা খুব বিরল। 'রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং কবিতার ছন্দের সঙ্গে গানের ছন্দের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত হয়নি (ফজলে এলাহি, ২০১২, পৃ. ১০০–১০৮)। ফলে, বিষয়ের অভিনবত্ব বিবেচনায় গবেষণাকর্মটি করবার সুযোগ রয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কবিতার ছন্দ ও গানের ছন্দের সম্পর্ক ও তুলনামূলক যেকোনো আলোচনাই বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক। বর্তমান গবেষণাটি সাহিত্য, সংগীত ও নন্দনতত্ত্ব– এইতিন জ্ঞানশাখার সমন্বিত গবেষণা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গানের ছন্দের এই দিকটি অনালোকিত ও স্বল্পচর্চিত। এটি একটি প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে গুরুত্ব ও তাৎপর্য পেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-নির্ভর শিল্প। এই প্রবন্ধ পাঠ-পূর্বক ছন্দ সম্পর্কিত গায়কের সচেতনতা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পকে যথাযথ উপস্থাপনেও সহায়ক হতে পারে, এমন আশা করা যায়।

বিশ্লেষণ

এবার আমরা নির্বাচিত গানের বাণী ও সুরের ছন্দ বিশ্লেষণ করব। রবীন্দ্রনাথের গানে শাস্ত্রীয়সংগীত-ভাঙা গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূজা পর্যায়ের ৪০০ সংখ্যক গানের বাণী ও সুর পরপর পর্যবেক্ষণ করছি–

গান ১

শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে– ফিরি হে দ্বারে দ্বারে–
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ১৬৪)

১´ ২ ৩

II{[ম]জ্ঞা -া রা রা। -া জ্ঞা । মা মা পা -াI [স্থায়ী]

শূ ন্ ন হা ০ তে ফি রি হে ০

I([প]র্সা -া ণা ধা। পা মা । মা -গা -মা -পা)}I

না ০ থ প থে প থে ০ ০ ০

I মা জ্ঞা রা [ম]গা। -া জ্ঞা । রা -[স]রা সা -াI

ফি রি হে দ্বা ০ রে দ্বা ০ রে ০

I সা র্সা না র্সা। -া র্সর্জ্ঞা । র্রা র্সা ণা ধাI

চি র ভি খা ০ রি০ হৃ দি ম ম

I ণা ধা ণা পা। ধা পা । মা -গা মা -পাII

নি শি দি ন চা হে কা ০ রে ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৮, পৃ. ৩২)

এই গানটি মূল গান 'রুম ঝুম বরখে'-র সুর হুবহু অনুসৃত হয়েছে (প্রফুল্লকুমার, ১৩৬৭, পৃ. ৩৫)। এবং ছন্দও মূল গানটির অনুগামী হয়েছে। মূল গান যে ধ্বনিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে, ভাঙা গানটিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। মূল গানের ধ্বনিবিন্যাস ও সুরবিন্যাস গানটি রচনায় প্রভাবিত করেছে, যদিও ব্রহ্মোপাসনার জন্যে এই গভীর বাণী রচিত হয়েছিল।

মূল গানের সুর অনুসরণ করে রচিত হওয়ায় গানের বাণীতে ছন্দের নিয়মিত কোনো ধাঁচ নেই। এটি মুক্ত ছন্দে লেখা হয়েছে। মূল গানে ব্যবহৃত ঠেকা–

ধা ঘেড়ে | নাগ ধি | ঘেড়ে নাগ | গদ দ্দি | ঘেড়ে নাগ | ধা

খেয়াল গাইয়ে-বাজিয়েগণ 'সুলতাল' নামে এই ঠেকাকে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানে 'সুরফাঁক্তা' নামে পাখোয়াজের সঙ্গে গানটি পরিবেশিত হয়। পাখোয়াজের ঠেক নিম্নরূপ বাজে–

ধা তেটে ধেৎ তা | ধেটে তা | তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা

অর্থাৎ, মূল গানে ব্যবহৃত ওই দুই-দুই-দুই-দুই-দুই ভাঙা গানে যথাযথ ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে চার-দুই-চারে বিন্যস্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে ঈশ্বর-বন্দনার অনুভবী বাণীর মুক্তছন্দ সুরের ছন্দে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি।

গান: ২
পূজা পর্যায়ের ৪৩৯ সংখ্যক গান।
সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত–
শির নত কত অপমানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ , পৃ. ১৭৬)

{সা সা II রা -সা রা রা। গা -রা গা গা। মা -ধা পা মা। -গা -া}-মা -রা I
সু খ হী ন্ নি শি দি ন্ প রা ধী ন হ য়ে ০ ০ ০ ০

I -া [র]পা মা -গা। [গ]মা -রা -া সা। -া রা [স]ন্া -া। সা সা সা সা I
০ ভ্র মি ০ ছ ০ ০ দী ০ ন প্রা ০ ণে স ত ত

I [র]মা -রা -া মা। মা মা পা পা। পা পা ণা ধা। পা [প]ণা ধা পা I
হা ০ য়্ ভা ব না শ ত শ ত নি য় ত ভী ত পী

I মগমা রা মা রা। মা পা ধা র্সর্রর্সা। ধা পধপা -া মা। গরা -গা সা সা II
ড়ি০০ ত শি র ন ত ক ত০০ অ প০০ ০ মা নে০ ০ "সু খ"

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০ক, পৃ.৩৭)

এই গানটি অর্থহীন তেলেনা ভেঙে, তেলেনার গৎ ভেঙে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। 'দারাদীম্ দারাদীম্ দারাদীম্ দারা' মূল গানের বাণীতে আমরা যে বিন্যাস পাই অক্ষরসমূহের, প্রায় হুবহু অনুসৃত হয়েছে ভাঙা গানে (প্রফুল্লকুমার, ১৩৬৭, পৃ. ৯৩)। পূর্ববর্তী গানটির মতো এখানেও সুর আগে এসেছে রবীন্দ্রনাথের মনে– গৎ-এর অর্থহীন ধ্বনিকে বহন করে। মূল গানে এবং ভাঙা গানে খেয়ালাঙ্গের ঠেকা বাজে। তারানা গানের অর্থহীনতা বাণীর মুক্ত ছন্দে অর্থ পেয়েছে ঠিকই, সুরবিন্যাসের ছন্দে তা প্রভাব বিস্তার করেনি রবং মূল গানের ছন্দও ঝোঁক হুবহু অনুসৃত হয়েছে ভাঙা গানটিতে।

৩.
প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের ২০ সংখ্যক গান–
কতবার ভেবেছিনু | আপনা ভুলিয়া ৮+৬

তোমার চরণে দিব | হৃদয় খুলিয়া। ৮+৬

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ৮৭৯)

সুরবিন্যাস নিম্নরূপ–

II র্সগা -া গা | গমা -া মা | মা -পা মা | গা -রা গা I

ক ০ ত বা ০ র ভে ০ বে ছি ০ নু

I মা -পা পা | সা -মা মা | রগা -া -রা | সা -া -া I

আ ০ প না ০ ভু লি ০ ০ য়া ০ ০

I সর্সা -া র্সা | না -ধপা পা | পধা -পা পা | পরা -া গা I

তো ০ মা র ০০ চ র ০ ণে দি ০ ব

I মা -া মধা | পা -া মা | গা -া -রা | সা -া -া II

হৃ ০ দ য় ০ খু লি ০ ০ য়া ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০গ, পৃ. ২৯)

মুল গানঃ "Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine,"

আকারমাত্রিক স্বরলিপিঃ

| গা গা গা মা -া মা । পা -মা গা রা গা মা ।

ড্রিঙ্ক টু মি ও ন্ লি উই থ্ দাইন্ আ ইজ্ অ্যান্ড্

(অনুরাধা, ১৪০৯, পৃপৃ. ৩৪–৩৫)

গানের বাণীটি অক্ষরবৃত্তে রচিত। মূল গানের স্বরলিপিতে ৬-৬ বিভাজন দেখালেও, শুনতে গিয়ে মূল গানটির গাঁথুনি টানা বারো মাত্রায় পাওয়া যায়। ভাঙা গানটি চলছে তিন-তিন-তিন-তিন করে, একতালের মতো করে, যার বোলবিন্যাস নিম্নরূপ–

ধিন ধিন ধাগে | তেটে তিন না। কৎ তে ধাগে | তেটে ধিন ধা | ধিন

রবীন্দ্রনাথের গানের এই সুরে আমরা দেখছি, প্রতিটি ঝোঁকের পর একটি করে স্বরের প্রলম্বন ব্যবহৃত হয়েছে অক্ষরবৃত্তে রচিত বাণীকে প্রকাশ করতে গিয়ে। বিলেতি গানের চলন হুবহু অনুসরণ না করে তার অন্তর্গত ঝোঁকের ব্যাপারটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। গানের বাণীর ছন্দের সঙ্গে সুরের ছন্দ এখানে সম্পর্কিত নয়, বরং মূল গানটি তার সুর ও ছন্দসুষমায় রবীন্দ্রসংগীতটিকে ঘিরে রেখেছে।

৪.

গীতিনাট্য মায়ার খেলার গান।

আহা, | আজি এ বসন্তে | এত ফুল ফুটে |

এত বাঁশি বাজে, | এত পাখি গায়, |

সা সা II রা -া রা -া। গা -া গা -মা। পা -মা গা -া। -া -া -া -া I

আ হা আ ০ জি ০ এ ০ ব ০ স ন্ তে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া পা -া। পধা -পা -মা -া। মপা -মা গা -া। -া -া -রা -সা I

এ ০ ত ০ ফু ০ ০ ল্ ফু ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

I রা -া গা -মগা। রা -গা রা -গরা। সন্‌া -রা সা -া। -া -া -া -া I

এ ০ ত ০০ বাঁ ০ শি ০০ বা০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া পা -া। মা -া পা -মা। গা -মা -পা -মা। -গা -মগা রগা সা II

এ ০ ত ০ পা ০ খি ০ গা ০ ০ ০ ০ ০য়্ "আ হা"

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ৬৭৯)

মূল গান: "Go Where Glory Waits Thee"

| সা -া -া সা রা -া গা -মা পা পা গা -া।

গো ০ ০ হোয়্যার্ গ্লো ০ রি ০ ওয়ে ইট্স্ দী ০

(অনুরাধা, ১৪০৯, পৃ. ৪৮)

গানের ছন্দটি অক্ষরবৃত্তের কাছাকাছি ধীর লয়ে ছয় মাত্রার পর্ব তৈরি করে মাত্রাবৃত্তের মতো চলতে চাইলেও তা মাত্রাবৃত্ত নয়, অক্ষরবৃত্তও নয়– এটাকে 'মিশ্র' বলা যায়। গানের বাণীর প্রথম চরণের 'বসন্তে' মাত্রাবৃত্তের হিসেবে চার মাত্রা হওয়ায় এবং এই গানে এমন যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ থাকায় এটি কোথাও-বা সাত মাত্রার পর্ব তৈরি করছে, ফলে তাকে মাত্রাবৃত্ত বলবার সুযোগ থাকেনি।

মূল গানটা একসঙ্গে টানা বারো মাত্রা দেখালেও তা চার-চার-চার করে চলেছে। ভাঙা গানে এসে তা চার-চার-চার-চার করে মোট ষোলো মাত্রার আবর্তন অর্জন করেছে। আমরা লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের শেষ চার মাত্রায় বাণী না বসিয়ে সুরটিকে চার মাত্রা টেনে নিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে– এভাবেই মূল গানের বারো মাত্রা থেকে ভাঙা গানের ষোলো মাত্রার আবর্তন নির্মিত হয়েছে। ত্রিতালের মতো ষোলো মাত্রার আবর্তন হলেও এ গানে ত্রিতাল বাজলে গানের ভাবের ও সুরের সঙ্গে তা সামঞ্জস্য বিধান করে না। ত্রিতাল খেয়ালাঙ্গের গানের সঙ্গে বাজানো হয়। অন্যদিকে, গানটির কিছু কিছু জায়গায় কীর্তনাঙ্গের লক্ষণ রয়েছে। যেমন– 'তারা ফিরেও না চায়, আহা' অংশের সুরে পুরোপুরিই কীর্তনাঙ্গ মান্য করা হয়েছে। ফলে, এই গানে শ্রীখোলের বোল-বাণী বাজালে গানের ছন্দ-মাধুর্য ফুটে ওঠে। যে বোলটি শ্রীখোলে বাজানো হয় সচরাচর এই গানের সঙ্গে তা নিম্নরূপ–

ধিগ -ধি নাগ ধিনি | ধিগি নানা ধিগি নানা | থিক -থি নাক থিনি | ধিগি ধানা ধিগি ধানা | ধিগ

অতএব, বলা যায়, মূল বিলাতি গানের ছন্দের পুরোপুরি অনুগামী না হয়ে রবীন্দ্রসংগীতটি সুরের স্বভাবের কারণে অভিনব ছন্দ-সুষমা লাভ করেছে। গানটি গাইতে গিয়ে দুই-দুই করে চলছে বলে মনে হয়। কারণ, বিদেশি সুরের অনুগামী হওয়ায় গাইবার ক্ষেত্রে দুই-দুইয়ে গাইবার প্রবণতা চলে আসে।

৫.
পূজা পর্যায়ের ১৭৬ সংখ্যক গান–

নিবিড় ঘন | আঁধারে | জ্বলিছে ধ্রুব | তারা। ৫+৩ ৫+২

মন রে মোর, | পাথারে | হোস নে দিশে | হারা ॥ ৫+৩ ৫+২ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮০খ, পৃ. ৮০)

রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নবতালে নিবদ্ধ এই গানের সুরবিন্যাস–

১́ ২ ৩ ৪ ১́ ২ ৩ ৪

II মা পা পা । ধা মা । পা -া । পা পা I ধা ধা না । ধা পা । মা -পা^ম । মা জ্ঞা I

নি বি ড় ঘ ন আঁ ০ ধা রে জ্ব লি ছে ধ্রু ব তা ০ রা ০

I জ্ঞা জ্ঞা মা । রা -া । রা -া^স । সা সা I সা -র্সা র্সা । ণা পা । ^মজ্ঞা -া । মরা -মা II

ম ন রে মো র্ পা ০ থা রে হো্ ষ্ নে দি শে হা ০ রা০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৮, পৃ. ৩৪)

গানের বাণীর বিন্যাসটা এমন যে, এটিকে [নিবিড় ঘন | আঁধারে জ্বলিছে | ধ্রুবতারা] ৫+৬+৪ ভাবতে ইচ্ছে করলেও তা নয়। লয়টা স্পষ্টতই মাত্রাবৃত্তের। প্রতিটি লাইনে বিন্যস্ত রয়েছে পাঁচ মাত্রার পর্ব ও অসম্পূর্ণ পর্ব, আবার পর্ব ও অসম্পূর্ণ পর্ব– ব্যাপারটি অভিনব।

বাণীর ছন্দের প্রথম পাঁচ মাত্রাকে সুরেও একইরকমভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। পর্বাতিরিক্ত 'আধারে'-র তিন মাত্রাকে টেনে প্রলম্বিত করে চারমাত্রা করা হয়েছে। বাণীর 'তারা' অংশের দুই মাত্রা সুরে এসে প্রলম্বিত হয়েছে চার মাত্রায়। বাণীর পর্ব ও পর্বাতিরিক্ত অংশ মিলে নয় মাত্রা হতে যতটুকু টান পড়ছে ঠিক ততটুকুই প্রলম্বিত রয়েছে সুরে। অর্থাৎ, মোট বাণীতে সাত মাত্রা হলে দুই মাত্রা টানতে হচ্ছে, আট মাত্রা হলে একমাত্রা টানতে হচ্ছে সুরে। বাণীর যে অংশটুকু পর্ব তৈরি করছে, তা হুবহু গানের ছন্দের প্রতি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাণীর ছন্দ দিয়ে গানের সুরের ছন্দ প্রভাবিত হয়েছে। গানের ছন্দ বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে নবতালের যে বোলটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজানো হয় তা নিম্নরূপ–

ধা দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে | ধা

৬.

বিচিত্র পর্যায়ের ৫৫ সংখ্যক গান।

দুয়ার মোর | পথপাশে, | সদাই তারে | খুলে রাখি। ৫+৪ ৫+৪

কখন্ তার | রথ আসে | ব্যাকুল হয়ে | জাগে আঁখি ॥ ৫+৪ ৫+৪

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ৫৬৮)

গানের সুরে নয় মাত্রার ছন্দ পাওয়া যায়। এখানে তালের কোনো নির্দেশ বা নামকরণ করা হয়নি। সুরবিন্যাস নিম্নরূপ–

II মা জ্ঞা -া রা সা রা গা মা পা I পা পধা -ণা ণধা পা মগা মা গা মা I

দু য়া র্ মো র প থ পা শে স দা০ ই তা রে খু লে রা খি

I পা ণা -া র্সা নর্রা র্র্সা ণা ধা পমা I মপা পধা -ণা ণধা পা মগা মা গা মপা II

ক খ ন্ তা র০ র থ আ সে০ ব্যা কু০ ল্ হ য়ে জা গে আঁ খি০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭খ, পৃ. ৭৩)

ঠিক পূববর্তী গানটির সঙ্গে এই গানের বাণীর ছন্দোগত ঐক্য আছে। পূর্ববর্তী গানের বাণীতে যেমন তিন মাত্রা বা দুই মাত্রার পর্বাতিরিক্ত অংশ ছিল, সেটা এই গানে নেই। এখানে রয়েছে চার মাত্রার পর্বাতিরিক্ত অংশ। ফলে, প্রতিটি পর্ব ও পর্বাতিরিক্ত অংশ মিলে যখন নয় মাত্রা আমরা পেয়ে যাচ্ছি বাণীতে, সুরে হুবহু সেই নয় মাত্রাই টানা বিন্যস্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গানের নতুন ছন্দ সৃজনে কথার ছন্দ যে নিয়মে চলছে, সেই নিয়মটাকেই সুরে মানতে চেয়েছিলেন। এই গান রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনাররই সার্থক প্রকাশ। গানটির সঙ্গে তবলার ঠেকা নবতালের মতো করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজানো হয়ে থাকে। গানের বাণী কীভাবে সুরের ছন্দকে প্রভাবিত করতে পারে, এই গানে সেই ব্যাপারটি চিহ্নিত আছে। এই গানে ঝোঁকের আধিপত্য নেই, তাল বাজলে বরং দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, ঝোঁক তৈরি হয়– যা বাণীর যথাযথ প্রকাশে বাধা তৈরি করে। তাল-বাদ্যের ঝোঁক এড়িয়ে পিয়ানো সহযোগে গানটি গাইলে বাণীর আধিপত্য বজায় থাকে। গানের বাণীতে থাকা ধ্বনিসমূহ গানের ছন্দের প্রতিটি মাত্রায় বাসানো হয়েছে– যা রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিরল ব্যাপার।

আমরা এবার লক্ষ করব, রবীন্দ্রকবিতা থেকে সরাসরি গানে রূপান্তরিত করা হয়েছে এমন কিছু গানের বাণীর ছন্দ ও সুরের বিন্যাসে যে ছন্দ রয়েছে তা পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে।

নবজাতক কাব্যের ‘উদ্বোধন’ কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। গানের কবিতাটিতে ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রয়েছে–

৭ক.

“প্রথম যুগের | উদয়দিগঙ্|গনে ৬+৬=২ [মধ্যখণ্ডন চিহ্নিত করার প্রয়োজনে ‘ঙ্গ’ ভেঙে দেখানো হলো]

প্রথম দিনের | উষা নেমে এল| যবে ৬+৬=২

প্রকাশপিয়াসি | ধরিত্রী বনে | বনে ৬+৬=২

শুধায়ে ফিরিল| সুর খুঁজে পাবে | কবে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭, পৃ. ১০৬) ৬+৬=২ ['উদ্বোধন', *নবজাতক*]

'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে' গানটির স্বরবিন্যাস লক্ষ করি–

I I ন্সা সা সা | রা রা রা I রা রা রা | রা রা -সা I
প্র০ থ ম যু গে র উ দ য় দি গ ঙ্

I রা মজ্ঞা -া | -া -া -মা I মা মপা পা | পা পা ধা I
গ নে০ ০ ০ ০ ০ প্র থ০ ম দি নে র

I মপা^ম মা -জ্ঞা | -া -া -মা I
উ০ ষা ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭১, পৃপৃ. ৫–৬)

গানের বাণী ছয় মাত্রার পর্ববিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

স্বরবিন্যাসে দেখা গেল, গানটি তিন-তিন ছন্দে নিবদ্ধ। সুরের ছন্দের সঙ্গে বাণীর ছন্দের কিছুটা ঐক্য দৃশ্যমান যে, সুরের ছন্দেরও ছয় মাত্রার আবর্তন রয়েছে। প্রথম লাইনের বাণী হুবহু সুরের ছন্দে বিন্যস্ত। গানটি গীতবিতানের শুরুতে মুদ্রিত। বাণী এবং সুর এমনভাবে অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে যে বোলের অধিকতর ঝোঁক গানের ভাবকে বিনষ্ট করতে পারে। বাণীর শুরুতে পর্বাতিরিক্ত যে অংশটুকু রয়েছে, তা সুরে এসে প্রলম্বিত হয়ে ৬ মাত্রার তালের আবর্তন পূর্ণ করেছে। সুরের প্রলম্বনে গানের বাণীতে যেখানে ঝোঁক পড়ছে, তা সুরে এসে মান্য হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রে– 'শুধায়ে ফিরিল' অংশের 'ল' পর্বের শুরুর মাত্রায় পড়লেও বাণীর আধিপত্যের কারণে ঝোঁক তৈরির সুযোগ কমে যাচ্ছে। ফলে তবলায় কী বাজবে সেটা নিয়ে চিন্তা করার চাইতে ছয় মাত্রার ঘের [আবর্তন] তৈরি করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।

৭খ.
বলাকার দীর্ঘ একটি কবিতার গীতরূপ লক্ষ করলে আমরা দেখব, তা অক্ষরবৃত্ত মুক্তকে বাঁধা পড়েছে বাণীর ছন্দে–

তুমি কি কেবলই ছবি | শুধু পটে লিখা ৮+৬

ওই যে সুদূর নীহারিকা | ১০

যারা করে আছে ভিড়| আকাশের নীড়, ৮+৬

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৫, পৃ. ২৫০) ৬ [*বলাকা*, ৬ সংখ্যক কবিতা]

অর্থাৎ, বাণীর ছন্দের মধ্যে যে প্রবহমানতা, বা মুক্তকের স্বভাব তা গানে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে চার-চার মাত্রিক ছন্দের অপূর্ব বিন্যাসে। 'তুমি কি কেবলই ছবি' গানের স্বরবিন্যাস লক্ষ করি–

II সা সা সা সা | রা রা রসা -রা I

তু মি কি কে ব লি ছ০ ০

I রা -পা -া -া | -া -া মা পা I

বি ০ ০ ০ ০ ০ শু ধু

I মধা ধপা মপা মজ্ঞা | -া -া -া -া I

প০ টে লি০ খা০ ০ ০ ০ ০

I পর্সা -া র্সা র্সা | ণর্সা -া র্সা ণা I

ও ই যে সু দু০ র্ নী হা

I ধা ণা -া -া |

রি কা ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫, পৃ. ১৫৬)

গানটিতে 'বলাকা' কাব্যের দীর্ঘ একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সুসংবদ্ধ করেছেন গানের বাণী হিসেবে। বাণী-প্রধান গান হওয়ায় সুরের ছন্দে কাহারবার চাঞ্চল্য নেই এই গানে। যে বোলটা বাণীর ভাব প্রকাশের অনুকূল হিসেবে সচরাচর বাজানো হয়, সেটা একটানা ধীর লয়ের–

ধাগ ধিন নাগে ধিন| ধাক তিন তাতা তেটে|ধা

অক্ষরবৃত্তের ধীর লয়ের স্বভাবটুকু এখানে রক্ষিত হয়েছে। ধারণা করা যায়, অক্ষরবৃত্তের পর্বস্বভাবটি রবীন্দ্রনাথকে আট মাত্রার আবর্তন সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছে।

৭গ.

এবার *ক্ষণিকা*র 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি লক্ষ করলে আমরা দেখব, তার বাণীতে স্বরবৃত্ত ছন্দ রয়েছে–

"কৃষ্ণকলি | আমি তারেই | বলি, ৪+৪+২

আর যা বলে| বলুক অন্য| লোক। ৪+৪+২

মেঘলা দিনে| দেখেছিলেম| মাঠে ৪+৪+২

কালো মেয়ের| কালো হরিণ|-চোখ।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৪, পৃ. ২৩৬) ৪+৪+২ ['কৃষ্ণকলি', *ক্ষণিকা*]

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানের স্বরবিন্যাস নিম্নরূপ:

I I সা -া | সা রা রা I রা গা | রা গা -মা I

কৃ ষ্ ণ ক লি আ মি তা রে ই

I [ম]রা গা | -া -া মা I পা পা | পা পা পা I

ব লি ০ ০ কা লো তা রে ব লে

I পা পা | -ধা পধা -না I -ধা -পা | -া -া -া I

গাঁ য়ে র্ লো০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৬, পৃ. ৭২)

উপরিউক্ত স্বরবৃত্তের বাণীবাহী গানটিতে আমরা লক্ষ করি, সুরের ক্ষেত্রে স্বরলিপিতে তা ২-৩-২-৩ ছন্দে চিহ্নিত থাকলেও গানটি তালছাড়া ঢালা গান হিসেবে গাওয়া হয়। ব্যাপারটি অভিনব যে, স্বরবৃত্তের মতো চটুল ছন্দের একটি গান তালবিহীন সুরে অন্তর্নিহিত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বাঁধতে পেরেছিলেন, গাইতে পেরেছিলেন। অনুরূপ কিছু গান, যেমন: 'শুধু তোমার বণী নয় গো', 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে' স্বরলিপিতে তাল নির্দেশিত থাকলেও তবলার সহযোগিতা ছাড়া গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানটি বাণীর ছন্দকে অগ্রাহ্য করে বাণীর ভাবের মধ্যে যে নাটকীয়তা রয়েছে তা টপ্পার ধরনে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে ঢালা গান হিসেবেই।

৭ঘ.

রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী* কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতাটিও গানে রূপান্তরিত হয়েছিল। গানটির বাণীর ছন্দে সাত মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রয়েছে। যেমন–

"খাঁচার পাখি ছিল,| সোনার খাঁচাটিতে| ৭+৭

বনের পাখি ছিল| বনে। ৭+২

একদা কী করিয়া | মিলন হল দোঁহে,| ৭+৭

কী ছিল বিধাতার|মনে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৩ক, পৃ. ৩৫) ৭+২ ['দুই পাখি', *সোনার তরী*]

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' গানটির স্বরবিন্যাস লক্ষ করি–

II সা রা -মা | মা মা মা পা I গা গমা -পা | মা পা পা পা I
খাঁ চা র্ পা খি ছি ল সো না০ র্ খাঁ চা টি তে

I সা সা -া | রা রা গা গা I মা পা -া | -া -া -া -া I
ব নে র্ পা খি ছি ল ব নে ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা ধা | ধা ধা ধা নধা I পা না না | [ন]ধা পমা গা মা I
এ ক দা কী ক রি য়া০ মি ল ন হ ল০ দোঁ হে

I পা না না | [ন]র্সা না ধা -না I [ন]ধা পা -া | -া -া -া -া I
কী ছি ল বি ধা তা র্ ম নে ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭ক, পৃ. ৬৪)

সাধারণত তিন-দুই-দুই তেওড়া তাল হিসেবে আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথ শেষের দুই-দুইকে চার মাত্রায় আবদ্ধ করেছেন এই গানে। তিন-চার মাত্রার এই ছন্দটি বাংলা গানে অভিনব। বাণীর শাসনে তা তৈরি হয়েছে ব'লে ধারণা করা যায়। গানটির তালে স্পষ্টভাবেই বাণীর ছন্দ প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, বাণীর ছন্দের সাত মাত্রার পর্ব গঠিত হয়েছিল তাকেও তিনে চারে বিন্যাস করা সম্ভব– সেটা সুরের ছন্দেও স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। সুরের প্রথম মাত্রা ও চতুর্থ মাত্রায় ঝোঁক দিতে হয় এবং তাতে গানটি শুনতে ভালো লাগে। গানের বাণীতে যা-কিছু পর্বাতিরিক্ত বা অসম্পূর্ণ পর্ব হিসেবে বিরাজ করছে, তা কিছু রবীন্দ্রনাথ সুরের পর্বের মধ্যে ফেলেছেন স্বরকে

অধিক মাত্রাব্যাপী প্রলম্বিত করে। সচরাচর তবলাবাদকগণ সাত মাত্রা না বাজিয়ে চৌদ্দ মাত্রার ঘের বাজিয়ে থাকেন বাণীর ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে।

৭৬.

'*মানসী*' কাব্যের 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি আমরা লক্ষ করব। পুরো গানটিই ৭ মাত্রার পর্ববিশিস্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে, 'মেঘস্বরে' শব্দটির যথাযথ উচ্চারণ এটিকে ৭ মাত্রাবৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বরলিপিতে রবীন্দ্রনাথ সেই বাধাটা দূর করে গেছেন। গানটির বাণীর কিছু অংশ লক্ষ করি–

এমন দিনে তারে| বলা যায় ৭+৪

এমন ঘন ঘোর| বরিষায়! ৭+৪

এমন মেঘস্বরে | বাদল-ঝরঝরে| ৭ (৮)+৭

তপনহীন ঘন | তমসায়। ৭+৪ (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৩খ, পৃ. ৩২৮) ['বর্ষার দিনে', *মানসী*]

এবার, 'এমন দিনে তারে বলা যায়' অংশের স্বরবিন্যাস লক্ষ করব–

[ধা পধা মা]

I I মা মা মা | গা রে গা সা I রা রমা মা | -া -া -া -গমা I

এ ম ন দি নে তা রে ব লা০ যা ০ ০ ০ ০য়্

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮৯, পৃ. ৩৪)

গানটির তালে আমরা তিন-চারের আবর্তন লক্ষ করি। আমরা বাণীর বিন্যাসের মধ্যে কোথাও কোথাও তিন-চারকে উসকে দেবার প্রবণতা দেখতে পাই। যেমন: 'এমন দিনে তারে', 'এমন ঘনঘোর' ইত্যাদি বাক্য সুরের বিন্যাসকে তিন-চারে নিবদ্ধ করতে প্রাণিত করে বলে ধারণা করা যায়। কোথাও কোথাও বাণীর কোনো ধ্বনিতে সুরের প্রলম্বন বর্ষার মেদুরতা ও বিরহবেদনাকে গানের ছন্দে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। গানের বাণী এখানে সুরের ছন্দ নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

৮.

বিচিত্র পর্যায়ের ২ সংখ্যক গান। তালফেরতা।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে

...

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,

...

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ৯০)

II পা -া পর্সা | ণা ধা পা I পা পা -া | -পা -ধা -ণা I
নৃ ত্ তে০ র তা লে তা লে ০ ০ ০ ০

I ণপা -র্সা র্সণা | ধা পা -ধা I ধপা -া পর্সা | ণা ধা পা I
০ ০ ন ট রা জ্ নৃ ত্ তে০ র তা লে

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭, পৃ. ৭০)

....

I মা -া | ধা -া ণা -া I ণর্সা -া | -া -া -া -ণধা I
নৃ ত্ তে ০ তো ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০র্

I ধা -া | ধর্সা -া ণা -ধা I ধপা -া | -া -া -া -া I
মু ক্ তি০ ০ র ০ রূ ০ ০ ০ ০ প্

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭, পৃ. ৭২)

...

II সমা -া মা মা | মা -া মা -া I মা -পা পা পা | পা -া মা -গা I
নৃ০ ত্ তে র ব ০ শে ০ সু ন্ দ র হ ০ লো ০

I মা -ধা ধা ধা | ধা -া ধা -ণা I ণপাঃ -ধণঃ ধা -া | -া -া -া -া I
বি ০ দ্রো হী প ০ র ০ মা ০০ ণু ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭, পৃ. ৭৫)

মুক্ত ছন্দে রচিত এই গানটি স্বরবিন্যাসের ছন্দ অভিনবত্ব লাভ করেছে। আমরা লক্ষ করি প্রথমে তিন-ছন্দ বাঁধা গানটি বাণীর প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে দুই-চার ছন্দে এবং শেষে চার-চার ছন্দে বিন্যস্ত হয়েছে। এই ব্যাপারটিকে তালফেরতা বলে অবিহিত করা হয়। শরৎ প্রকৃতির 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা', 'বিশ্ববীণা রবে' গানের সুরের ছন্দেও তালফেরতার ব্যবহার

আমরা লক্ষ করি। এটা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় নির্মাণ। এর সঙ্গে বাণীর ছন্দের সম্পর্ক নেই। ভাব প্রকাশটাই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯.

বর্ষাপ্রকৃতির ১২৯ সংখ্যক গান–

আজি ঝরঝর| মুখর বাদর|দিনে ৬+৬+২

জানিনে, জানিনে| কিছুতে কেন যে| মন লাগে না ॥ ৬+৬+২

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ , পৃ. ৪৭৭)

এবার, গানটির স্বরলিপি আমরা পর্যবেক্ষণ করব–

দুই-চার-দুই-চার ছন্দ;

II মা -া | পা -া পা -া | পা -া | পা -া পা -ধা I

আ ০ জি ০ ঝ ০ রো ০ ঝ ০ রো ০

I মা -া | পা -া পা -ধা | মা -ধপা | মা -জ্ঞা জ্ঞ -মা I

মু ০ খ ০ র ০ বা ০০ দ ০ র ০

I মা -া | পা -া -া -া | -া -া | -া -া -া -া I

দি ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭১, পৃ. ৫১)

এই গানের সুরান্তর: দুই-দুই ছন্দ

সা সা II { সা সা | রা রা I রা রা | রা গা I মা মা | পা -মা I

আ জি ঝ রো ঝ রো মু খ র বা দ র দি ০

I পা -া | (সা সা)} I -া -া I পা -র্সা | র্সা -না I র্সা -া | -র্সা -র্রা I

নে ০ আ জি ০ ০ জা ০ নি ০ নে ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭১, পৃ. ৫৪)

বাণীর ছন্দে মাত্রাবৃত্তের চাঞ্চল্য থাকলেও এই গানের প্রথম সুরটিতে যে লয় ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে গানটির বাণী করুণ হয়ে ধরা দিয়েছে। বিরহ-বেদনার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে গানের এই ছন্দে। পরবর্তী যে সুরান্তর আমরা লক্ষ করি, তাতে দুই-দুই ছন্দটি অত্যন্ত চঞ্চল। ফলে, গানের বাণীতে যে বিরহ-বেদনা না চাপা পড়ে গানটি নৃত্যপর হয়ে উঠেছে।

১০.

সুরের ছন্দ বাণীর ছন্দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে কিছু গানে–
পূজা পর্যায়ের ২০১ সংখ্যক গান

আমার |সকল দুখের |প্রদীপ জ্বেলে| দিবস গেলে| করব নিবে|দন– ২+৪+৪+৪+১

আমার |ব্যথার পূজা| হয়নি সমা|পন॥ ২+৪+৪+১

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ , পৃ. ৯০)

এবার গানটির স্বরবিন্যাস লক্ষ করি–

সা সা I I সণ্ া -া সা -া | সমা -মজ্জা মা -া I মপা -া পা -া | -জ্জা -া জ্জা মা I

আ মার্ স ০ ক ল্ দু০ ০০ খে র্ প্র ০ দী ০ ০ প্ জ্বে লে

I মা -পা পা -া | -া -া পা ধা I ধণা -া ণা -া | -ণধা -র্সা র্সণা দা I

দি ০ ব ০ ০ স্ গে লে ক র্ ব ০ ০ ০ নি বে

I পা -া -া -া | -া -া

দ ০ ০ ০ ০ ন্

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭খ, পৃ. ১৩৬)

বাণীর ছন্দটি স্বরবৃত্তের। অতিপর্বের ব্যবহার রয়েছে। সুরের বিন্যাসটি এরকম যে, তা বাণীকে শাসন করছে। সুরের বিন্যাসটিই এমন যে, বাণীর ছন্দে যেখানে পর্ব পড়ছে, সেখানে সুরের বিরতি দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে, 'আমার সকল দুখের প্রদীপ/ জ্বেলে দিবস/ গেলে করব নিবেদন' গাইবার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। দিবস গেলে নিবেদন করবার বিষয় সুরের বিন্যাসগত কারণে আর খুঁজে পাওয়া যায় না সাধারণ গায়কিতে। পাঠকের কারণে গানের কবিতা

যা *গীতবিতান*-এ রক্ষিত, তা কখনো ব্যর্থ হয় না। অর্থাৎ. বাণীতে ভাবটি রক্ষিত থাকে। গানের বাণীর ছন্দের যে পর্ববিভাজন, তা বজায় রেখে পাঠ করলে দিবস গেলে নিবেদন করবার বিষয়টা পাওয়া যায়, অথচ গানে সেই অর্থটা আর থাকছে না। এমনটি হবার কারণ হিসেবে বলা যায়, গানটি শুরু হয়েছে পঞ্চদশ মাত্রা থেকে এবং ষোলো মাত্রা পর্যন্ত গাইলে 'প্রদীপ' পর্যন্ত গাওয়া হয়। এর পর আর দম ধরে রাখা সম্ভব হয় না। পরবর্তী দুই মাত্রায় 'জ্বেলে' শব্দটি থাকলেও তা একদমে গাওয়া যায় না। গাইলেও শ্রোতাদের আরাম হয় না শুনতে। ফলে, বিরামটি সেখানে গিয়েই পড়ে। আর, পরবর্তী সুরবিন্যাসে বিরামের ফাঁদ পাতা থাকে 'জ্বেলে দিবস' বলবার পরই। সুরে ছন্দ এই গানে বাণীকে পরোয়া করছে না বলে মনে করা যায়।

১১.

মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গান–
এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি–
যারে ভালো বেসেছি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে–
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে–

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ , পৃ. ৬৬১)

অন্তরা অংশের সুরবিন্যাস:

II{সা সা -া | রা -মা মা | -া পা -দণদা | [দ]পা -া -া I
ফু ল ০ দ ০ লে ০ ঢা ০০০ কি ০ ০
I পা পা -দপা | [প]মা -া পা | -দপা মা -পা | মা -জ্ঞমা -জ্ঞা I
ম ন ০০ যা ০ ব ০০ রা ০ খি ০০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৬খ, পৃ. ৫৪)

গানটির বাণীর ছন্দে যে লয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা মাত্রাবৃত্তের। পর্বের মধ্যে সমান সংখ্যক মাত্রা মাত্রাবৃত্তে থাকে বলে এটিকে নির্দিষ্ট করে কোনো মাত্রাবৃত্তে নির্দেশ করা যায় না। 'পাছে', 'রেখো', 'না হয়' ইত্যাদি অতিপর্ব হিসেবে রয়েছে। অসম্পূর্ণ পর্বও এখানে পাওয়া যায়। তিন-তিন ছন্দের বারো মাত্রার আবর্তনের এই গানের স্থায়ী অংশটি ত্রিমাত্রিক একতালের তিন-তিন মাত্রার ছন্দকে মান্য করে চললেও অন্তরার সুরবিন্যাস এখানে আলাদা । আমরা দেখছি, সুরের ছন্দ কীভাবে আধিপত্য নিয়েছে। এই গানের চলনের কারণে গাইতে গিয়ে তাল যেন না কাটে

সেই সতর্কতা থাকে গায়কদের। এমনকি ভাবটা সহজে প্রকাশিত হতে পারে এমন সহজ বিন্যাসও গানের সুরে দেখতে পাওয়া যায় না। সুরের ছন্দ বাণীতে রক্ষিত ধ্বনিকে ঝোঁকে না ফেলে কখনো-বা প্রলম্বিত স্বরে ঝোঁক তৈরি করছে। ‘দলে ঢাকি’, ‘যাবো রাখি’তে এসে দুই-দুইয়ে চলছে যেন এইগান। ‘ঢাকি’ শব্দের ‘ঢা’ ধ্বনিতে ঝোঁক দেবার স্বাভাবিক প্রবণতা ব্যহত হওয়ায় গায়ক কিছুটা সতর্ক হয়ে থাকেন এই গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে।

১২.

প্রেম পর্যায়ের ২৯৩ সংখ্যক গান–

একদা |তুমি, প্রিয়ে, |আমারি এ |তরুমূলে | ৩+৪+৪+৪

বসেছ |ফুলসাজে| সে কথা যে | গেছ ভুলে| ॥ ৩+৪+৪+৪

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮০খ, পৃ. ৩৮৭)

II -া মা | মা পা -া I $^{\text{প}}$ণা ণা | ধা পা -া I পর্সা $^{\text{র্স}}$ণা | ধা ণা -া I

০ এ ক দা ০ তু মি প্রি য়ে ০ আ০ মা রি এ ০

I ধা ণা | ধা ণা -া I -া ণা | ধা ণা -া I $^{\text{ণ}}$র্সা ণা | ধা পা -া I

ত রু মূ লে ০ ০ ব সে ছ ০ ফু ল সা জে ০

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৭, পৃ. ১৫১)

বাণীর ছন্দের চলন, লয় মাত্রাবৃত্তের। রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ বিবেচনায় এই গানটি ব্যতিক্রম। সুরের দুই-তিন ছন্দের এই গানটি অর্ধ ঝাঁপের স্বভাব অনুযায়ী সম এবং তালের তৃতীয় মাত্রায় ঝোঁক পড়বার কথা। এই গানে সেই ঝোঁকটি কখনো কখনো সম-এ না পড়ে দ্বিতীয় মাত্রা ও তৃতীয় মাত্রায় পড়েছে– যা রবীন্দ্রপ্রবর্তিত তালের যে স্বভাব, তা থেকে ব্যতিক্রম। প্রবর্তিত তালে আমরা লক্ষ করেছি বাণীর বিন্যাস ও বাণীর ছন্দের গুরুত্ব সেখানে ছিল। এই গানে বাণীর শুরুতে আমরা লক্ষ করব, তিন মাত্রার অতিপর্ব রয়েছে। ওই অতিপর্বের শুরুতে বাণীবিহীন একটি স্বরকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তার গানের স্বরলিপিতে। আমরা লক্ষ করলাম, ‘একদা’ বলবার আগে একটি মাত্রা ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সম-এর ঝোঁক ছিল। ‘বসেছ’ বলবার ক্ষেত্রেও সুরে একই ঘটনা ঘটেছে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের গানে বাণীর ছন্দ ও সুরের ছন্দের সম্পর্ক বহুরৈখিক, শৈল্পিক রসাবেদনে বহুস্বরস্পর্শী। বাণী ও সুর যুগপৎ চললেও তাদের সম্পর্ক সুনিশ্চিত নয়। প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাস্ত্রীয় গান ভেঙে রবীন্দ্রসংগীত রচনা করেছিলেন, যার অধিকাংশই ছিল উপলক্ষ্যগত। সুরকার হিসেবে পরিণত হবার আগেই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে সেইসব গান লিখতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। সেই সময়ে সুরকে হুবহু অনুসরণ করবার প্রবণতার কারণে মূল গানের ধ্বনিবিন্যাস ভাঙা গানের সুর ও ছন্দকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের এমন প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর পরবর্তী গানসমূহে দুর্লক্ষ। তাঁর যুবক বয়সে রচিত বিলেতি ভাঙা গানে মূল গানের সুর ও ছন্দের প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যসংগীতের কোনোরকম সুর ও ছন্দের প্রভাব আমরা দেখতে পাই না বললেই চলে। সংগীতকার হিসেবে ক্রমযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত গানের ছন্দকে অনুসরণ করবার পাশাপাশি গানের বাণীর ছন্দকে ভিত্তি করে স্বতন্ত্র ছন্দরীতি নির্মাণ করেন, যা বাংলা গানে নতুন সংযোজন। তাঁর গানের বাণীর প্রাধান্য কখনো-বা সুরের ছন্দে ব্যবহৃত তালের বোলকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাণীতে থাকা নিখুঁত ছন্দে বাঁধা গানকে তিনি সুরের ছন্দে মুক্ত করে দিয়েছেন– স্বরলিপিতে তালের নির্দেশ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ছকেবাঁধা কাঠামো-উৎকেন্দ্রিক স্বাধীনতা তিনি গ্রহণ করেছেন। একই বাণীবিশিষ্ট গানে সুরান্তর করেছেন, ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দে বেঁধেছেন একই গান। একই গানের সুরে একাধিক তাল ঘুরে-ফিরে এসেছে। সুরের আধিপত্য তাঁর কোনো কোনো গানের বাণীর স্বাভাবিক গীতল স্রোতধারায় ব্যতিক্রমী ঢেউ তুলেছে– এমনকি সেসব গানের কোনো কোনোটি প্রচ্ছন্ন অর্থবিপত্তিকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। ফলে, রবীন্দ্রসংগীতে বাণীর ছন্দ ও সুরের ছন্দের যে সম্পর্ক, তা কখনো সরল, কখনো সমান্তরাল, কখনো বিপ্রতীপ, কখনো দূরবর্তী– সম্পর্কের এই অনিশ্চয়তা ও বৈচিত্র্যের কারণেই রবীন্দ্রসংগীত চিরকালীন হয়েও চিরনবীন-নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

অনুরাধা পালচৌধুরী। (১৪০৯)। *বিলাতীগানভাঙা রবীন্দ্রসংগীত।* সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

পবিত্র সরকার (১৯৮২)। 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও রূপ'। *রবীন্দ্রসংগীতায়ন* ১ [সম্পা. সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী], প্যাপিরাস, কলকাতা।

প্রফুল্লকুমার দাস। (১৩৬৭)। *রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা* তৃতীয় খণ্ড। সুরঙ্গমা, কলিকাতা।

ফজলে এলাহি, চৌধুরী (২০১২)। 'রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের মুক্তি'। *বাংলাদেশের হৃদয় হতে* [সম্পা. সন্‌জীদা খাতুন], ছায়ানট, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৩)। 'রবীন্দ্রনাথের গানে গদ্য ও পদ্য'। *রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা* [সম্পা. সুব্রত রুদ্র], প্রতিভাস কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৩৪৫)। *গীতমালিকা* ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৭১)। *স্বরবিতান* ঊনষষ্টিতম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৭৬)। *স্বরবিতান* ত্রয়োদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৭৬খ)। মায়ার খেলা। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৭৭)। *স্বরবিতান* দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৭৭ক)। *কাব্যগীতি।* বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৭৭খ)। *গীতপঞ্চাশিকা* [স্বরবিতান ১৬]। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

(১৩৭৮)। *স্বরবিতান* চতুর্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

(১৩৮০ক)। *স্বরবিতান* অষ্টম খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

(১৩৮০খ)। *গীতবিতান*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(১৩৮০গ)। *স্বরবিতান* পঞ্চত্রিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৮৯)। *কেতকী।* বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলিকাতা।

(১৩৯৩ক)। *রবীন্দ্ররচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৩খ)। *রবীন্দ্ররচনাবলী* প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৪)। *রবীন্দ্ররচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৫)। *রবীন্দ্ররচনাবলী* ষষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৭)। *রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ* খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৯)। *সংগীতচিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

শঙ্খ ঘোষ। (১৯৮২)। *এ আমির আবরণ*। প্যাপিরাস, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। (১৯৭৬)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।